Bangladesh
Journal of
Political
Economy

Research Note-5

© 2017 Bangladesh Journal of
Political Economy
Vol. 31, No. 5, January 2017, pp. 513-520
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

নারী অধিকার ও সমাজ সচেতনতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

শাহানারা বেগম*

সারকথা: *নারী সমাজের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও সমাজে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী তার অধিকার থেকে কেবল বঞ্চিতই নন বরং তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর দ্বারা নির্যাতনের শিকার।আধুনিক যুগে অনেক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারীরা সমাজে তাদের কিছু কিছু অধিকারের কিতাবী স্বীকৃতি পেলেও বাস্তবে তার তেমন একটা প্রয়োগ দেখা যায় না বিশেষত বাংলাদেশের মত দেশে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-মানস 'নারী' বিষয়ক যে 'মিথ' তৈরী করেছে তাতে নারী পুরুষের অধস্তনই কেবল নয় বরং সে হলো তার ভোগের সামগ্রী। এ 'মিথ' নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মনোজগতে সমভাবে ক্রিয়াশীল,তাই আমাদের মত সমাজে নারী এখনো স্বাধীন সত্ত্বা হিসাবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি, কেবল তাই নয় এ প্রতিষ্ঠা করা যে দরকার সে চেতনাও অনেক নারীর মধ্য গড়ে ওঠেনি। । মূলত অধস্তনতার এই মিথ থেকে সমাজ মানসকে মুক্ত করা না গেলে নীতি কিংবা আইন করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।এমনকি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ব্যাক্তিগত দক্ষতাও এ ক্ষেত্রে তেমন একটা কার্যকরি ভুমিকা রাখতে পারবে না। আমাদের দেশে বেশ কিছুকাল যাবৎ দেশের প্রধান মন্ত্রী ও বিরোধীদল নেতা নারী কিন্তু তারপরও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন সেভাবে হয়নি, হয়নি তার অধিকার প্রতিষ্ঠা। অনেকে বলে থাকেন যে, নারীশিক্ষার বিস্তার এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাস্তবে যখন দেখি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী নারীরা যৌতুকের বলি কিংবা যৌন নিপীড়নের শিকার হন অথবা কর্মজীবী নারী হওয়া সত্ত্বেও পারিবারিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার ভুমিকা গৌণই থেকে যায় তখণ বক্তব্যটি প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়ে। আসলে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে যতক্ষণ নারীরা সচেতন না হবেন, কিংবা সমাজে নারীও যে স্বাধীন মানুষ এ চেতনার বিকাশ ঘটানো না যাবে ততদিন পর্যন্ত নারী তার অধিকার পাবে না। অবশ্যই শিক্ষা ,অর্থনৈতিক সক্ষমতা ইত্যাদি নারীকে তার অধিকার আদায়ে খানিকটা যোগ্য করে কিন্তু মনোজাগতিক পরাধীনতা থাকলে এসব তেমন কোন কাজে আসে না।বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মানসিকতার পরিবর্তে মানবীয় সমাজমানসিকতার নির্মাণই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায়। আর তা নির্মাণ করতে হবে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ মিলে। এ মূল কাজটিকে বাদ দিয়ে নিছক নারীবাদী আন্দোলন কিংবা কাগুজে আইন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। আর এ সমাজ সচেতনতার কাজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে নারীদেরকে। জায়া-ভগ্নি-মাতা নির্বিশেষে সকল নারী ও নারীর সহযোগী পুরুষকে বুঝতে হবে প্রথমত ও প্রধানত নারী মানুষ,আর মানুষ হিসাবে তার প্রাপ্য অধিকার যেখানেই হরিত হবে সেখানেই যৌথভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ প্রতিরোধ যেমন নারীকে সুরক্ষা দেবে তেমনই তার অধিকার প্রতিষ্ঠার লাগাতার লড়াইকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।*

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, নড়াইল সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ

১. ভুমিকা

একটি সমতাভিত্তিক অসম্প্রদায়িক বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে আমাদের মূল অর্জন ১৯৭২ সালের সংবিধান। পবিত্র সংবিধানের ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ অনুচ্ছেদে নারীর সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে ২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ”সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী”। ২৮(২)নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ”কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ন, নারী-পুরুষের জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না”। কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জনের ৪৬ বছর পর নারীর অবস্থান নিয়ে চিৎকার করতে হচ্ছে, নারী কি? নারী কে? নারী কি মানুষ নয়? স্বাধীনতা অর্জনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেও স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার অধিকার তার নেই কেন !

জনসংখ্যার শতকরা বন্টন থেকে দেখা যায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, যারা প্রতিনিয়ত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক এবং পারিবারিক দিক থেকে বৈষম্য ও বিবিধ নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট । অন্যান্য অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মত এ দেশের নারীরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসাবে দ্বিবিধ নিগ্রহের শিকার, একদিকে দরিদ্র হিসাবে ধনিক শ্রেণীর শোষণ ও নির্যাতন, অপর দিকে নারী হিসাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নিজস্ব নির্যাতন। নিচের তথ্য থেকে খানিকটা ধারনা পাওয়া যেতে পারে।

- ইউএনডিপি‘র হিসাব অনুসারে যে সব মানুষকে দরিদ্র মনে করা হয় তার ৭০শতাংশ নারী।
- গত ২০ বছরে সম্পূর্ণ দরিদ্র সীমার (absolute proverty Limit) নিচে নারীদের সংখ্যা ৫০শতাংশ বেড়েছে, যেখানে পুরুষের ক্ষেত্রে এই হার ৩০শতাংশ।
- উন্নয়নশীল দেশসমূহে নিরক্ষর নারীদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি।
- প্রাথমিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদের তুলনায় ১৩ শতাংশ কম।
- মেয়েদের মজুরি পুরুষদের মজুরির তুলনায় মাত্র ৭৫ শতাংশ।
- শিল্পোন্নত দেশসমূহে মেয়েদের বেকারত্বের হার ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি।
- যারা বিনা মজুরিতে শ্রম দেয় বা দিতে বাধ্য হয় তাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশই নারী।

উৎসঃ (United Nations Development Fund for Women & World Report on human Development)

উপরের তথ্য থেকে দেখা যায় নারীরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান, শ্রমের মজুরি, বেগার শ্রম এবং বেকারত্বের মত অর্থনৈতিক নির্ধারক সমুহের দিক থেকে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। পরিণতিতে দরিদ্রকরণের ভয়াবহ চক্রে সে ক্রমান্বয়ে অধঃপতিত হচ্ছে। দূর্ঘটনা ও বিবাহ বিচ্ছেদের হার ক্রমশবৃদ্ধির কারনে নারীর উপর নির্ভরশীলতার হারও প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। অপরদিকে সামাজিক কিংবা পারিবারিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা স্বাধীন মত প্রকাশের কোন সুযোগ নারী পায় না বললেই চলে। সম্পত্তি ও সম্পদের অধিকারহীন নারী হয় সমাজে উদ্বাস্তু ও ভাসমান। শ্রমশক্তি হিসেবে নারীকে অবমূল্যায়ন করা হয়। এমন কি প্রথাগত অর্থনৈতিক জরীপেও আবশ্যক স্বাভাবিক গৃহকর্মকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে স্বীকার করা হয় না। নারী আক্রান্ত হয় পুরুষতন্ত্রের পাশবিক আক্রমণের। দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক পরিবারের নারী থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কেউই এর হাত থেকে নিস্তার পায় না। যৌতুক, স্বাধীন মতপ্রকাশ, ক্ষমতাসীনদের লালসার খোরাক হতে রাজি না হওয়া, ইত্যাদি বিবিধ কারণে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে এই

পাশবিকতা। যার ব্যাপ্তি ইভটিজিং থেকে ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ থেকে হত্যা পর্যন্ত প্রসারিত। এসব ছাড়াও আমাদের সমাজে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত অবশেষের প্রতিনিধি বিভিন্ন ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী ধর্মীয় বিধানের অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগের মাধ্যমে নারীর বিকাশের পথকে রূদ্ধ করার চেষ্টা চালায় এবং নারীকে শৃঙ্খলিত ও অবরোধবাসিনী করে তাকে আরো বেশি প্রান্তিক ও অসহায় করে তোলে। যে-সমাজ বিশৃঙ্খল, যে-সমাজে মৌলবাদের বিকাশ ঘটছে যে সমাজ পুরুষাধিপত্যবাদী, যে সমাজে কারোই নিরাপত্তা নেই, আর নারী যেহেতু সমাজে সবচেয়ে অসহায়; তাই সেখানে নারী নির্যাতন, সহিংসতা ও ধর্ষণ প্রকটরুপে দেখা দেয়। বি.বি.এস(বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৮৭.১২% নারী প্রতিনিয়ত নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়। শহর অঞ্চলে এই নির্যাতনের হার ৭৯.২৮% হলেও গ্রামে নির্যাতনের হার আরও বেশী, যার পরিমান ৮৮.৭৭% ।

সমস্যার বাংলাদেশের নারীসমাজের কারণ অনুসন্ধান এবং প্রতিকারের পথ।

বাংলাদেশের প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ অনুসারে নারীরা প্রধানত গৃহাভিমূখী, এর সাথে ধর্মের ব্যবহারের মাধ্যমে এই গৃহাভিমূখীতাকে আরো বেশি শক্তিশালীভাবে সংরক্ষিত করা হয়। পিতৃতন্ত্র এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসারে নারী কেবল গৃহাভিমূখীই নয় সাথে সাথে পরিবারের অভ্যন্তরে সে পুরুষের অধস্তনও বটে। সমাজের অন্য সকল ক্ষেত্রে এই অধস্তনতা আরো অনেক বেশি প্রকট। এই মতাদর্শ নারীকে কেবলমাত্র পুনঃউৎপাদনের হাতিয়ার (Reproduction Tools) হিসাবে তুলে ধরে। ফলে সমাজে আদর্শ নারী নামে একটি মিথ (Myth) তৈরী হয় যা অনুসারে নারীর আদর্শ হয়ে ওঠে "সন্তান ধারন, লালন ও পালনে সক্ষমতা " এ থেকে সমাজে নারীদের সম্পর্কে যে প্রধান ধারণা সমূহ গড়ে উঠে সেগুলি হলো ঃ-

* নারী হলো ঘরের শোভা।

* যতই শিক্ষিত বা চাকুরিজিবি হোক নারীর আসল কাজ ঘরে।

* নারী হবে নরম, কোমল, কমনীয় ও সহনশীল স্বভাবের।

* নারীরা পুরূষের তুলনায় দুর্বল, মেধা, মনন ও কর্মদক্ষতায় কম ক্ষমতাসম্পন্ন।

* নারী সবসময় পরিবার ও স্বামীর কাছে সমর্পিত ও নিবেদিত হবে।

* স্বামীর সন্তুষ্টির উপর স্ত্রীর ইহলোক পরলোক নির্ভর করে।

* লজ্জাশীলতা হলো নারীর প্রধান পরিচয়।

উপরের প্রচলিত ধারণাগুলি প্রমাণ করে আমাদের সমাজে নারী জন্মগতভাবে এমন একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শৃঙ্খলাবদ্ধ যেখানে তার প্রথম পরিচয় হলো পুরুষের অধস্তনত। এই অধস্তনতার মূল্যবোধ কেবল পুরুষ নয় অধিকাংশ নারী ও আত্মস্থ করে নেয়। এর ফলে ' নারী শাড়ি, গয়না, বাড়ী, গাড়ি ছাড়া আর কিছু বোঝে না ' কিংবা 'বাইরের জগৎ সম্পর্কে মেয়েরা কি বুঝবে' ইত্যাদি প্রচলিত বয়ান কেবল পুরুষ নয়, অধিকাংশ নারীও তার মননে ধারণ করে এবং সেইভাবে নিজেকে তৈরী করে।

সমাজের এই মূল্যবোধের পাশাপাশি আর একটি দিক না বললে আমাদের সমাজের নারীদের অবস্থা পরিস্কার ভাবে বোঝা যাবে না । এ সমাজ-কাঠামোতে নারী হলো একটি ভাসমান জনগোষ্ঠী। যাদের একাংশ অন্য কোন পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে একটি পরিবারে এসেছে বৈবাহিক সূত্রে। অন্যাংশ কোন পরিবারে জন্ম নিচ্ছে, প্রতিপালিত হচ্ছে, এবং প্রস্তুতি নিচ্ছে অন্য কোন অজানা পরিবারে যাবার জন্যে।

এর কারণে আমাদের সমাজে নারীর জীবন আবর্তিত হয় ‘ ভাল ঘর, ভাল বর ’ পাওয়ার আকাঙ্খায়। নারীর যোগ্যতা বলতে তাই ‘ ভাল বর, ভাল ঘর ’ পাওয়ার যোগ্যতাকেই বোঝানো হয়। ফলে নারীর যোগ্যতার প্রধান বিষয় হয়ে দাড়াঁয় তার দৈহিক সৌন্দর্য (যা পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসাবে নারীকে পুরুষের কাছে অধিক কাম্য করে তোলে) পিছনে পড়ে যায় তার মেধা মনন বা অন্য সব ধরনের যোগ্যতা।

বর্তমান সমাজের এই সকল মূল্যবোধ ও নারীর অবস্থাকে টিকিয়ে রাখা ও তাকে ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের জন্য কর্পোরেট পুঁজিতার বিবিধ পণ্য বিপননে ব্যাপকভাবে যেমন নারী শরীর ব্যবহার করে তেমনই নারীকে একটি শরীরসর্বস্ব ভোগ্যদ্রব্য হিসাবে তুলে ধরে। প্রচলিত বিজ্ঞাপনসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রায় সকল বিজ্ঞাপনের মূল ম্যাসেজ হলো নারী জীবনের লক্ষ্য **‘আদর্শ গৃহবধু, সুনিপূণ গৃহিনী, ও পুরুষের চোখে সৌন্দর্যের প্রতীক হওয়া’**। কেবল কর্পোরেট পুঁজিই নয়, ধর্মীয় মৌলবাদও বিষয়টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। পুঁজি যেখানে নারীকে ঘরের বাইরে এনে তাকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে তুলে ধরে, ধর্মীয় মৌলবাদ সেখানে ভোগ্যপণ্য হিসাবে নারী শরীরকে ব্যক্তিভোগের লক্ষ্যে নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে চার দেওয়ালের ভিতর আটকে রাখতে চায়। আপাতভাবে এদের কাজকে আলাদা মনে হলেও উভয়ের উদ্দেশ্য নারীকে নিছক ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার করা।

সামাজিক মূল্যবোধগত অবস্থানের পাশাপাশি শ্রমশক্তি হিসাবে নারীকে অবমূল্যায়ন করা এমনকি অস্বীকৃতির একটি ধারাও এ সমাজে প্রচলিত রয়েছে। নারীদের কাজের একটি বড় অংশকে আবশ্যক স্বাভাবিক গৃহকর্ম হিসাবে দেখা হয় যার কোনরূপ বিনিময় মূল্য বা মজুরি স্বীকৃত নয়। এমনকি আমাদের প্রথাগত অর্থনৈতিক জরিপেও একে অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে স্বীকার করা হয় না। এই অস্বীকৃতির পাশাপাশি নারী শ্রমকে অবমূল্যায়িতও করা হয়। আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি নারী শ্রমিক যে পোশাকশিল্পে কাজ করে তার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব এখানে পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় নারী শ্রমিকের মজুরির হার অনেক কম। কেবল মজুরি নয় কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব ও মর্যাদাগত দিক থেকেও ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে, রয়েছে কর্মপরিবেশগত সামাজিক অবস্থানগত বৈষম্য।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই অধস্তনতার কারণে নারীকে পুরুষের তুলনায় কম গুরুত্ববহ ও কম মূল্যবান মনে করা হয় , পাশাপাশি নারী জীবনের মূল লক্ষ্য ‘ ভাল বর ভাল ঘর ’এ কথা মেনে নেওয়ার কারণে সমাজে উদ্ভুত হয় যৌতুক নামক এক ভয়াবহ প্রথার, যার বলী হয় অজস্র নারী। বিশেষত শারীরিকভাবে কম সুশ্রী বা সামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পরিবারের নারীর ক্ষেত্রে এর ব্যাপ্তি ও ভয়াবহতা অত্যন্ত বেশি।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি আমাদের সমাজে নারীরা আধিকার বঞ্চিত এবং বিবিধ ধরণের বৈষম্যের শিকার। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে এই বঞ্চনা ও বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে ? প্রচলিত অন্যতম ধারণা হলো নারীর শিক্ষা , দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের অভাব দূর করা গেলে নারীর সমস্যার সমাধান হবে। আমরা মনে করি নারী অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ হলেও যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে বিশেষত পুরুষ ও নারীদের মধ্যে অধিকার সচেতনতা গড়ে তোলা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা খুব একটা কাজে আসবে না। অর্থাৎ নিছক নারী বা পুরুষ হিসাবে নয় সমাজের একজন মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ঐ সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের সংগ্রামে অংশগ্রহণে যতক্ষণ পুরুষ বা নারীরা উদ্বুদ্ধ না হবে ততক্ষন পর্যন্ত কেবল শিক্ষা বা কর্মসংস্থান খুব বেশি কিছু করতে পারবে না। বর্তমানে কর্মে নিয়োজিত নারীদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব ঘরের

বাইরে কাজে নিয়োজিত হওয়ার পরও তারা ঘরের কাজ থেকে মুক্তিতো পানই না বরং কর্মক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব পালনের কারণে ঘরের কাজে অবহেলার বোধ তাদের তাড়িত করে। এই তাড়নায় বাইরের কাজ শেষে ঘরে ফিরে নারীরা সাধ্যানুযায়ী 'সার্বক্ষনিক গৃহ পরিচর্যায় ' নিয়োজিত হন। অর্থাৎ কর্মজীবি নারীকে ঘরের কাজ ও বাইরের কাজ উভয়ই করতে হয়। এ ছাড়া নারীদের কর্মপরিবেশ এবং নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনা করলে দেখা যাবে কর্মজীবি নারীরা তাদের কর্মক্ষেত্রেও নানামুখী নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হন। Joekes S. Trade Related Employment for Woman in Industry and Services নামক গবেষণাপত্রে উন্নয়নশীল দেশের নারী শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে বলেন "ম্যানেজার ও সুপারভাইজার নারী শ্রমিককে ড্রাগ খেতে উৎসাহ দেয়, তাদের ক্লান্তি দূর করতে! গর্ভনিরোধ খেতে বলে যাতে তাদের গর্ভে সন্তান না আসে। যে মেয়েরা আপত্তি করে, তারা বরখাস্ত হয়। মারধোরও চলতে পারে। কোন কোন জনকে খুন বা পঙ্গু করে দেওয়া হয়।" আমাদের গর্মেন্টস শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে উল্লেখিত নাইজেরিয়ান নারী শ্রমিকদের অবস্থার চেয়েও অনেক ভয়াবহ ঘটনা প্রতিদিন ঘটে চলেছে। যখন দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় পেরোনো মেয়েরাও প্রতিনিয়ত যৌতুকের বলী হচ্ছেন কিংবা যৌতুকের বিয়েতে মত দিচ্ছেন বা দিতে বাধ্য হচ্ছেন তখন শিক্ষার বিষয়টি কতখানি কার্যকরি হতে পারে তা সহজেই বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ তার 'নারী, পুরুষ ও সমাজ ' গ্রন্থে বলেন "বাহ্যিক দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা, সম্পদ, অর্থ ইত্যাদির কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপাত মর্যাদা লাভ করলেও এ সমাজে নারীরা মুলত জন্মগতভাবে পুরুষের অধস্তন থাকার মতো সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শৃঙ্খলাবদ্ধ।"আমরা দেখতে পাচ্ছি নারী অর্থ, বিত্ত, শিক্ষা, চাকুরী সম্পন্ন হলেও সমাজের নিজস্ব মতাদর্শ দিয়েই সে মুল্যায়িত হয়। ফলে তার ব্যক্তি-বিকাশ কিংবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র প্রকাশিত হতে পারে না তাই উন্নয়ন তথা জীবনযাত্রায় মৌলিক সুবিধাদি ভোগে তাদের অর্জন সীমিতই থেকে যায়।

৩. প্রতিকার

অনেকে মনে করেন রাষ্ট্র অধিকহারে নারীবান্ধব কঠোর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারী বৈষম্য ও নারী নির্যাতন বন্ধ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমরা মনে করি নারীবান্ধব আইন নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ততক্ষণ পর্যন্ত খুব বেশি ভুমিকা রাখতে পারবে না যতক্ষন না নারীরা তাদের অধিকার আদায়ে সচেতন ও সংগঠিত শক্তি হিসাবে সমাজে নিজেদের অবস্থান তৈরী করতে সক্ষম হবে। আইনের কথা প্রসঙ্গে আমরা ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ অধ্যাদেশ. ১৯৮২ও ১৯৮৬ সালের যৌতুক নিরোধ সংশোধনী অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক) শাস্তি অধ্যাদেশ. ১৯৮৮ সালের নারী নির্যাতন (নিবর্তনমূলক শাস্তি সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ সালের পারিবারিক আদালত (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, এবং ১৯৯৫ সালে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত বর্ধিত করণের কথা আমরা বলতে পারি। এতসব আইন প্রণয়নের পরও বিদ্যমান পরিস্থিতি খুব একটা পাল্টায়নি। আসলে নারী নির্যাতন সামগ্রিক নারী অধস্তনতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ, কাজেই নারী অধস্তনতার সমাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে নারী নির্যাতন রোধে যত কঠোর আইনই প্রণয়ন করা হোক না কেন তা খুব বেশি কার্যকর ফল বয়ে আনতে পারবে না। নানাবিধভাবে যারা ক্ষমতার সাথে যুক্ত তাদের বিরূদ্ধে লড়াইতে অধস্তন, দূর্বল, নিম্নমর্যাদার নারীকে এ সমাজ বেশিদুর এগোতে দেয় না। তাই প্রণীত আইনের খুব বেশি সুফল নারীরা ভোগ করতে পারে না।

এতক্ষণ যে নারী অধিকার ও সচেতনতার কথা বলা হলো এবার আমরা অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার আর্ন্তজাতিক প্রেক্ষিতটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। দীর্ঘকাল ধরে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা ও আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়টি পাদপিঠে আসে ১৯৬০ এর দশকের শেষাংশে এবং বিশ্ব উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি সামনে চলে আসে। উদ্ভব হয় WID

(Woman in Development) ধারণার । এর প্রভাবে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ এবং ১৯৭৬-৮৫ কে আন্তর্জাতিক নারী দশক ঘোষণা করে। পাশাপাশি ১৯৪৫ সালে নারী পুরুষের মধ্যে সমতার নীতিমালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রথম আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ সনদের পূর্ণবাস্তবায়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের নারীদের অবস্থা সম্পর্কিত কমিশনের ২৫তম সভায় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরকরণের খসড়া দলিল প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে ‘ সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি ’ এই শ্লোগান নিয়ে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গৃহীত হয় ‘বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা’। দীর্ঘ ৪ বৎসরের বিবিধ আলোচনা সমালোচনার পর ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ‘নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ’ বা ঈঊউঅড (ঈড়হাবহঃরড়হ ড়হ ঊষরসরহধঃরড়হ ড়ভ অষষ ভড়ৎসং ড়ভ উরংপৎরসরহধঃরড়হ অমধরহংঃ ডড়সবহ) গৃহীত হয়। মোট ৩০টি ধারা বিশিষ্ট এই সনদের ১-১৬ নারী পুরুষের সমতা, ১৭-২২ সিডওর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব, ২৩-৩০ সিডওর প্রশাসন বিষয়ক ধারা সমুহ রয়েছে। এই সনদে ঘোষণা করা হয় “নারীর প্রতি বৈষম্য, অধিকারের সমতা ও মানব মর্যাদার প্রতি সম্মানের নীতির লংঘন ঘটায়; নিজ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের মত সমান শর্তে নারীর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমাজ ও পরিবারের সমৃদ্ধির বিকাশ ব্যহত করে এবং নিজ দেশ ও মানবতার সেবায় নারীর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ আরও কঠিন করে তোলে।” [বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে ২.১৩(ক), ১৬.১(গ,চ) ধারা সংরক্ষণসহ উক্ত সনদে স্বাক্ষর করে । ১৯৯৭ সালে ১৩(ক) ও ১৬.১(চ) ধারার আপত্তি প্রত্যাহার করে নেয়।] এরপর ১৯৮০ তে কোপেনহেগেন, ১৯৮৫তে নাইরোবি এবং ১৯৯৫ তে বেইজিং বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে নারী অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

আন্তর্জাতিক এই সকল প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ৮মার্চ সর্বপ্রথম তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ‘ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ’ ঘোষণা করেন যা মুলত ছিল ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন তথা বেইজিং সম্মেলণে গৃহীত ১২ ইস্যুর (নারী ও দরিদ্র, নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, নারী ও স্বাস্থ্য, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, নারী ও সশস্ত্র সংঘাত, নারী ও অর্থনীতি, ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী, নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, নারীর মানবাধিকার, নারী ও তথ্যমাধ্যম, নারী ও পরিবেশ, মেয়ে শিশু) আলোকে রচিত। নীতিটি শেষ পযর্ন্ত কার্যকরি হতে পারেনি পরবর্তী সরকার ২০০৪ সালে নতুন করে নারীনীতি ঘোষণা করেন যা ছিল পূর্বে ঘোষিত নীতি অপেক্ষা পশ্চাদপদ। এটিও বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে আবারও নারীনীতি ঘোষিত হয় সেটিও কার্যকর হয়নি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঘোষণা করেছেন। আমরা মনে করি এই নীতি নারীর সকল অধিকারকে স্বীকৃতি না দিলেও তা অনেকগুলি অধিকারকে নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে যা নারী অগ্রযাত্রায় সহায়ক হবে। মৌলবাদী গোষ্ঠি এ নীতির বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে এবং ধর্মীয় জিগির তুলে নারী অধিকার হরণের পুরাতন পথ ধরেছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দুরীকরনের জন্য এই নারী নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। পাশাপাশি সিডও (CEDAW) সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন ও সকল ধরনের নারী নির্যাতন প্রতিহত করা অতীব প্রয়োজন। এ গুলি বাস্তবায়ন ও সমাজের নারী অধস্তনতার মূল্যবোধ পরিবর্তনের জন্য সকল স্তরের নারী ও প্রগতিশীল মানবিক পুরুষদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা তাকেই আমরা সমাজ সচেতনতা বলে চিহ্নিত করছি। অর্থাৎ সমাজ সচেতনতা কেবল একটি ধারণা নয় বরং একই সাথে এটি একটি করনীয় কাজ। এই সচেতনতার বিকাশের জন্য সকল প্রকার নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন নারী সমাজকে সংগঠিত করে সামাজিক শক্তি হিসাবে তার বিকাশ সাধন করা। গনমানুষের

অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত তাঁর বাজেট প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেছেন, নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ জাতীয় বাজেটে থাকতে হবে এবং লাগাতারভাবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। এই প্রয়াসে দরিদ্র নারী ও শিশুর মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করার জন্য জাতীয় বাজেটে তা অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। চাহিদাসমূহ হলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি। নারীর সামাজিক নিরাপত্তা, সমতা এবং ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে উদ্দেশ্য-নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট-সহজবোধ্য বড় মাপের বরাদ্দসহ সময় নির্দিষ্ট পথ নির্দেশনা থাকতে হবে।*নারী-উদ্দিষ্ট (Gender sensitive) কর্মসূচী ও প্রকল্পসমূহকে সুস্পস্টভাবে চিহ্নিত করে তা সবিস্তার উন্নয়ন বাজেটে উল্লেখ করতে হবে। এ ধরণের কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য হ'ল মহিলাদের কর্মসংস্থান, কর্মজীবী মহিলাদের আবাসন(গার্মেন্টস্সহ), মহিলাদের পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, আশ্রায়ন, বিধবাভাতা, দু:স্থ মহিলা ভাতা, শিক্ষকদের ৬০% মহিলা, মহিলাদের নিরাপত্তা, যোগাযোগ সুবিধা, ডেকেয়ার সেন্টার, বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি।*সকল শ্রেনির নারী উদ্যোক্তাদের অধিকার উৎসাহিত করার জন্য ঋণনীতির পরিবর্তন আনতে হবে।একই সঙ্গে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বাজেটে বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে।*নারীর সামগ্রীক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে গতানুগতিকতার বিপরীতে বাজেটে নারীর জন্য বিশেষত দরিদ্র-প্রান্তিক নারীদের দারিদ্র-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে বরাদ্দ কয়েকগুন বৃদ্ধি করতে হবে। জেন্ডার বাজেট বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা থাকতে হবে। সেই সাথে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন ও তার বাস্তবায়নের সংগ্রামের কাজটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মনে রাখা দরকার এ কাজ একটি লাগাতার প্রক্রিয়া তাই সাংগাঠনিক কাঠামো ছাড়া নিছক ব্যক্তি উদ্যোগে এ কাজকে বেশিদুর এগিয়ে নেওয়া যাবে না। কাজেই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমেই নারীদের সংগঠিত হতে হবে এবং এগিয়ে আসতে হবে সমাজ সচেতন মানুষদের। তবেই সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে অধিকারহীন নারী পাবে তার অধিকার ও দেশ পাবে উন্নয়নের হাতিয়ার এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়নের শিখরে পৌছাতে বাংলাদেশের বেশী সময় লাগবে না।

তথ্যপঞ্জী

১. আবুল বারকাত,আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ও জামাল উদ্দিন আহম্মেদ- বাজেট প্রস্তাবনা-২০১৬-১৭

২. হুমায়ুন আজাদ, নারী

৩. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় , মার্চ ২০১১-জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১

৪. মজুমদার, প্রতিমা পাল এবং জহির, সালমা চৌধুরী – বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ,বি আই ডি এস।

৫. মুহাম্মদ, আনু- নারী, পুরুষ ও সমাজ, সন্দেশ ১৯৯৭।

৬. আহমেদ হাসিনা – অধিকার, সংগঠন ও সমাবেশীকরনের সমস্যা ঃ প্রসঙ্গ গার্মেন্টস নারী শ্রমিক, সমাজ নিরীক্ষন সংখ্যা- ৬৯

৭. করিম, নিলুফার আহমেদ – শিল্পক্ষেত্রে মহিলা, জেন্ডার নীতি ও প্রয়োগ– জেন্ডার এবং উন্নয়ন।

৮. Delphy Christine – Sharing the Same Table : Consumption and the Family.

৯. Kabeer, Naila – Women's Labour in Bangladesh Garment Industry, Choice and constraints. Cross Cultural Perspectives on Women, vol.12.

১০. গার্মেন্টস কথা – মানবাধিকার সংখ্যা ১৯৯৮।

১১. রহমান কাওসার 'জনকণ্ঠ' এক অসম প্রতিযোগিতায় নারী শ্রমিক ১৬ জুন '৯৮।

১২. আকতার ফরিদা – 'চিন্তা' নারী শ্রমিকের দাবী সর্বস্তরে জনপ্রিয় করতে হবে।

৩১ শে মার্চ ১৯৯৮।

১৩. শায়লা, কাজী – শোষনের শিকলে বাঁধা ১৫ই জুন,'৯৯।

১৪. উইম্যান ফর উইম্যান গবেষণা ও পাঠচক্র – নারী ও উন্নয়ন, প্রাসংগিক পরিসংখ্যান, ১ম সংস্করন, মার্চ ১৯৯৫।

১৫. রুশিদান ইসলাম, রহমান – উন্নয়নশীল কর্মকান্ডে বাংলাদেশের নারী সমাজ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশ গ্রহণ। বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা ৭ম খন্ড কার্তিক সংখ্যা।

১৬. আকতার তাহমিনা – মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৮. Ainun Nahar, Mijan – Empowerment of Women.

১৯. জামান সৈয়দ তারিকুজ – বাংলাদেশের শিল্প শ্রমিকের প্রলেতারিত হওয়ার প্রক্রিয়া ও মাত্রা : একটি জরিপ বিশ্লেষণ। বাংলাদেশ উন্নয়ণ সমীক্ষা –১২শ খন্ড।